১

পাতাল আর কতদুর

মীজান রহমান

শেষ পর্যন্ত আমরা সত্যি সত্যি হারালাম তাঁকে। সাথে সাথে চলে গেল একটি দুর্দান্ত সাহসী কণ্ঠ। তাঁর মত দৃপ্ত গলার ক্রুদ্ধ গর্জন কি আর শোনা যাবে দেশে ? অচিরেই হয়ত না। তাঁর মত মানুষ খুব বেশি জন্মায় না। বিশেষ করে আমাদের মত দুর্ভাগা দেশে। এমনই দুর্ভাগা এই দেশ যে বিরাট একটি কৃতী সন্তানকে হারিয়েও সে বিরহে কাতর হতে পারছে না। বিরহ, বেদনা, শোক, দুঃখ, আনন্দ, প্রেম, এসব মানবিক অনুভূতিগুলো একে একে হারিয়ে ফেলছে আমার দেশ, হুমায়ুন আজাদের দেশ। তাইতো তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমাকে তুমি বাংলাদেশের কথা জিজ্ঞেস করো না।" তাঁর মৃত্যুর শোকে বিহ্বল হবার শক্তি এই দেশটির নেই।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, মৃত্যু যদি বরণ করতেই হল তাঁকে 'উপযুক্ত' সময়ে করলেন না কেন। মৃত্যুর কোনও উপযুক্ত সময় আছে কি ? তবু, কথাটা একেবারে যুক্তিহীন নয়। সেই যে চাপাতির ঘা'টা খেলেন তিনি বাংলা অ্যাকাডেমির সামনে, তখনই যদি মৃত্যু এসে যেত তাহলে তিনি শহীদ হয়ে উঠতেন গোটা জাতির কাছে, স্বাধীনতার সপক্ষশক্তি দারুণ রোষে ফেটে পড়তে পারত, জনগণের নে জাগতে পারত একটা প্রচ□রকম মৌলবাদবিরোধী মনোভাব। যুক্তিটা আকর্ষণীয়, কিন্তু কতটা বাস্তবানুগ সেটাই প্রশ্ন। প্রথমত 'শহীদ' শব্দটাতেই আমার আপত্তি। যতদুর মনে পড়ে হুমায়ুন আজাদও পছন্দ করতেন না শব্দটা। 'শহীদ'রা স্বর্গে যায়, যার অস্তিত্ব এখনো প্রমাণ হয়নি, কোনদিন হবেও না। আজাদ সাহেবের নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবার বাসনা ছিল না – হুরপরী আর সুরাপানের লালসাতে তিনি আক্রান্ত হননি। তিনি ছিলেন এক দুঃসাহসী যোদ্ধা – কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী বা শক্তির কাছে কখনো তিনি জলাঞ্জলী দেননি তাঁর বিশ্বাস আর আদর্শকে, কোনও পার্থিব বা অপার্থিব স্বার্থ আর মুনাফার আকর্ষণে। তাঁর যুদ্ধের কোন সৈন্যসামন্ত ছিল না, তিনি একাই যুদ্ধ চালিয়েছেন যা কিছু তাঁর কাছে অপশক্তি মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে। তাঁর যুদ্ধের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধের কোন সাদৃশ্য নই, সুতরাং মধ্যযুগের 'শহীদ' পদবীটিও তাঁর বেলাতে প্রযোজ্য নয়।

তারপর আসে 'দারুণ রোষে' ফেটে পড়ার ব্যাপারটা। ষাট আর সত্তর দশকের স্ে–াগানের মত শোনায় কথাটা, বেশ আরাম লাগে, আশা জাগে যে এই বুঝি একটা বিপ–ব নেমে এল। কিন্তু বিপ–ব আকাশ থেকে নামে না। তার একটা আবহাওয়া লাগে। সেই আবহাওয়া দেশে তৈরি হয়নি এখনো। তেত্রিশ বছরের পশ্চাদপদতার বোঝা বয়ে বয়ে জাতির পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, তার কলিজা পুড়ে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, তার কি আছে 'দারুণ রোষে' নড়ে ওঠার শক্তি ? সে তো ক্ষতবিক্ষত, খ□বিখ□, তার নৈতিক চেতনা
প্রায় অবলুপ্ত – যার আভাস হুমায়ুন আজাদের লেখাতেই ফুটে উঠেছে বারবার। একটা বড় মৃত্যু একটা জাতির চিত্তকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে তখনই যখন সেই চিত্তের ভেতরে একটা সুস্থ স্পন্দন বিরাজমান থাকে। কিন্তু আমাদের এই মরা জাতির শরীরে তো সেই স্পন্দন নেই। আজকের বাংলাদেশের ভেতরে পড়ে আছে একাত্তরের আরাধ্য বাংলাদেশের নির্জীব কঙ্কাল। যেটুকু শক্তি তার এখনো আছে তা নিয়ে সে শুধু নিজেকেই ধ্বংস করে যাবে, আর কাউকে নয়।
আমার মতে হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুটা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। তিনি শত্রুর ইচ্ছাতে মৃত্যুবরণ করেননি, করেছেন প্রকৃতির ইচ্ছাতে। যারা তাঁর মরা লাশ ফেলে যেতে চেয়েছিল বাংলা অ্যাকাডেমির সামনে তিনি তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মৃত্যুর দুতকে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের শর্তে তিনি বিদায় নেননি, নিয়েছেন নিজেরই শর্তে। যেভাবে তাঁর জীবন কেটেছে সেভাবেই ঘটেছে মৃত্যু – প্রচ□রকম আত্মপ্রত্যয় ও অহংবোধের মধ্যে। এ–মাসে না ঘটে ফেব্রুয়ারীতেই যদি মৃত্যু ঘটত তাঁর তাহলে কি বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠত মৌলবাদের বিরুদ্ধে ? আমার মনে হয় না। বাঙালি জাতি বলে কি সত্যি সত্যি কোন জাতি আছে দেশে ? যে জাতি এখনো পিতার পরিচয় নিয়ে বালসুলভ কলহে লিপ্ত, যে–জাতি স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিকে ক্ষমতার আসনে বসাতে দ্বিধা করেনি সে–জাতি কি জাতিত্বের মর্যাদা অর্জন করেছে ? মৌলবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কারা ? যারা নিজেরাই মৌলবাদের নেশাতে বুঁদ হয়ে আছে ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আগে বাম রাজনীতি করত, অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। এখন তো তারা অস্ত্রের ব্যবসা করে, হলদখল আর সন্ত্রাসের রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন রাজনীতিতে তাদের উৎসাহ নেই। তাহলে বলুন, রাস্তায় নামবে কারা ? হুমায়ুন আজাদের ভক্ত ছাত্ররা ? তাদের কি জানের ভয় নেই ? তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ? তাঁরা তো বুদ্ধির বিবৃতি তৈরি করাতেই ব্যস্ত, রাস্তায় নামবার সময় কোথায় তাঁদের ?
বাংলাদেশের অন্যান্য গুণীজন থেকে হুমায়ুন আজাদকে পৃথক করে ভাবা যায় নানা দিক থেকে। তাঁর মত বিশাল প্রতিভা যে দেশে আর নেই বা আগে ছিল না তা আমি বলছি না, কিন্তু তাঁর মত বহুমুখী সৃষ্টিশীলতা হয়ত সমকালীন লেখকদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আলস্য বা কর্মবিমুখতা বলে কোন জিনিস তাঁর চরিত্রে ছিল না। হাজার প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর কলম কোনদিন থেমে থাকেনি। আমার জানা ছিল না যে তাঁর লেখক জীবনের সুচনা আসলে কবিতায়। ১৯৭৩ সালে, বয়স যখন ২৬, প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম বই, কাব্যসঙ্কলন 'অলৌকিক ইস্টিমার'। তাঁর অন্যতম সতীর্থ তাজ হাশমীর ভাষ্য অনুযায়ী যৌবনে তিনি কেবল কাব্যজগত নিয়ে মগ্নই ছিলেন না, সাহিত্যের গদ্যরূপের প্রতি খানিক উন্নাসিকতার ভাবও পোষণ করতেন, বিশেষ করে প্রবন্ধ, আলোচনা, অবলোকন ইত্যাদি। যেন ওই কাজগুলো অনর্থক সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। পরিবর্তনটা কখন কিভাবে শুরু হল বলা মুশকিল, কিন্তু নব্বুইয়ের গোড়া থেকেই তাঁর গদ্য যেন বন্যার জলের প–াবনধারায় বইতে আরম্ভ করল। যেন অবশেষে তিনি স্বগৃহের সন্ধান ২ পেলেন। কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দেননি অবশ্যি, কিন্তু গদ্যের ভেতরেই যেন নিঃশেষে ঢেলে দিলেন নিজেকে। এ পর্যন্ত ঠিক ক'টা বই লিখেছেন তিনি জানি না। শুধু গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সমালোচনাতেই সীমাবন্ধ নন তিনি। ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার ইতিহাস ও বাক্যতত্ত্বের ওপরও প্রচুর লেখালেখি করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার সেরা পা□ত বলে গণ্য করা হয় তাঁকে। ছোটদের উপযোগী বইও তিনি লিখেছেন। তাঁর এই বিশাল কর্মসম্ভারের পূর্ণ মুল্যায়ন সম্ভবত এখনো হয়নি। আমার পক্ষে তার আংশিক

মূল্যায়নও সম্ভব নয় কারণ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মাত্র পাঁচটিই আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর 'নারী', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', ও 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' আমার খুবই ভাল লেগেছে। 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' বইটিতে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার মত আবেগমুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ ও সাহসী মূল্যায়ন আমি আর কোথাও পড়িনি। অসংখ্য লেখক অসংখ্য রচনা প্রকাশ করেছেন শেখ মুজিবের ওপর। তাদের অধিকাংশই স্তাবকজাতীয়, যারা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করতে লজ্জা পান। আরেকদল আছেন কেবলই নিন্দুক – শেখ মুজিব সম্বন্ধে ভাল কিছু বলার জিনিস তাঁরা খুঁজে পান না। কিন্তু ইতিহাসে স্পষ্ট সাক্ষ্য আছে এমন কথা বলার সাহস কেবল হুমায়ুন আজাদের লেখাতেই পেলাম। 'ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল'এ তাঁর বক্তব্য বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই, হুমায়ুন আজাদের কোন লেখাতেই বলিষ্ঠতার অভাব নেই, কিন্তু উপন্যাস হিসেবে বইটি মানোত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা তার বিচারের যোগ্যতা আমার আছে বলে মনি করি না। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'পাক সার জমিন', যাকে কেন্দ্র করে এত আলোড়ন আস্ফালন আর বিস্ফোরণ, ওটা সম্পর্কে আমার একটিই মন্তব্য ঃ বইটা তিনি না লিখলেও পারতেন। অতিরিক্ত রাগের মাথায় যে কোন কাজ করতে নেই বইটা তারই প্রমাণ, অন্তত আমার মতে।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলো বিষয়বস্তুতে পৃথক হলেও একটি মৌলিক সুর সবগুলোতেই বর্তমান – সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর ক্রুদ্ধ ও শে–ষাত্মক মনোভাব। যখনই সুযোগ পেয়েছেন ঈশ্বর, দেবতা, নবী, স্বর্গ, ফেরশতা – এইসব প্রচলিত ধারণাগুলোকে ধূলিসাৎ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হল জামাতী মুসলমান, যদিও বাঙালি মুসলমান মাত্রই তাঁর কাছে একটি করুণ হাস্যকর জীব ছাড়া কিছু নয়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "বাঙালি + মুসলমান = এটা কোনো রোগের নাম ?" এমনিতেই তিনি বাঙালি জাতির ওপর মহারুষ্ট। তাঁর 'বাঙালি ঃ একটি রুগ্ন জনগোষ্ঠী ?' লেখাটি পড়লেই বোঝা যাবে বাঙালি সম্বন্ধে তাঁর কি মতামত। ওতে যদি মুসলমান যোগ হয় তাহলে সোনায় সোহাগা বটে। বাঙালি মুসলমান বলতে যে শোচনীয় ছবিটা দাঁড়ায় তাতে আরেকপ্রস্থ আরবি লেবাস জুড়ে দিলে দাঁড়ায় ধর্মান্ধ মোল–া, বর্তমান যুগের ওহাবী আর মওদুদী দরবেশ। একাত্তরের এই জামাতী হুজুরদের পাকিস্ত ানদরদী ভূমিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বাধীনতাকামী বাঙালির তাজা রক্ত দেখেছেন চোখের সামনে, ধর্ষিতা নারীর বিধ্বস্ত দেহ তাঁর চেতনায় দাবানল সৃষ্টি করেছে। সেই দাবানল বুকে পুষে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ওই মধ্যযুগীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে। তারই বজ্রদামামা বারবার বেজে ওঠে তাঁর লেখালেখিতে। আজকের বাংলা সাহিত্যের হুমায়ুন আজাদ একাত্তরের বধ্যভূমিরই রক্তাক্ত ফসল। তাঁর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ঃ এযুগের বলিষ্ঠতম বিদ্রোহী লেখক।

হুমায়ুন আজাদের রচনাবলী থেকে ধর্ম, বিশেষ করে গোঁড়া মুসলমান ধর্ম, সম্বন্ধে যে–চিত্রটা গেঁথে যায় মনে তাতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে মুসলমানদের তিনটে প্রধান আবিষ্টতা (ইংরেজীর ড়নংবংংরড়হ শব্দটির সঠিক বাংলা আমি খুঁজে পাইনি। তিনি এটাকে একপ্রকার মানসিক ব্যাধি বলে আখ্যা দিয়েছেন)। এক, আল–া। দুই, মসজিদ। তিন, নারী (সমার্থে যৌনতা)। মুসলমানই বোধহয় একমাত্র ধর্মীয় গোষ্ঠী যাদের প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে তাদের সৃষ্টিকর্তার (হুমায়ুন আজাদের মতে যা একেবারেই কাল্পনিক) নামটি অহরহ উচ্চারিত হয়। উঠতে আল–া, বসতে আল–া, খেতে আল–া, যেতে আল–া, ফিরতে আল–া, শৌচাগারে আল–া, শোবার ঘরেও আল–া। আল–া দিয়ে তারা হালাল খায়, আল–া দিয়ে হারাম খায়, আল–া দিয়ে ফকির খাওয়ায়, আল–া দিয়ে মাছি তাড়ায়, আল–া দিয়ে গরু জবাই করে, আজকাল আল–া দিয়ে মানুষও জবাই করে। প্রতিদিন লক্ষবার আল–হু আকবর না বললে তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়। আগে লোকে 'খোদা হাফেজ' বলত, অনেকে এখনো বলে। কিন্তু ওয়াহাবী–মওদুদী ফতোয়ার ফলে 'খোদা'কে নির্বাসনে পাঠিয়ে 'আল–া'কে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। সত্যিকারের মুসলমান ফারসি–তুর্কী শব্দ ব্যবহার করবে না, খাঁটি আরবি ব্যবহার করবে। আল–া ঁহরষরহমঁধষ – একভাষী। আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষা তিনি বোঝেন না। এটাকে অবসেশন ছাড়া আর কি বলবেন।

মসজিদ আর নারী এদু'য়ের কোন্‌টি প্রথম কোন্‌টি দ্বিতীয় তা নিয়ে হুমায়ুন আজাদের লেখাতে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তবে আমার মনে হয় নারী ছাড়াও দু'চারদিন বাঁচতে পারে মুসলমান পুরুষ, কিন্তু মসজিদ ছাড়া তারা একেবারেই অসহায়। এদের কা□কারখানা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় আল–া মসজিদ ছাড়া আর কোথাও থাকেন না। সেই কারণেই বাঙালি মুসলমানের হাতে কিছু টাকাপয়সা (এমনকি চুরিডাকাতি খুনখারাবির টাকাও) হলে প্রথমেই তারা মায়ের নামে বা বাবার নামে একটা মসজিদ তৈরি করার উদ্যোগ নেয়। এতে ইহকাল পরকাল দু'কালেরই উপকার। দেশের লোক ভক্তিতে মাথা নত করে থাকেন, আল–াতা'লাও পুণ্যের খাতায় নাম লিখে রাখলেন। দুর্নীতি সুনীতি আর চুরিচোট্টামির কথা কে মনে রাখে। একটা মসজিদ মানেই আগামী ইলেকশনে নির্ঘাৎ জয়, নেতানেত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ, কে জানে বড়রকমের একটা লাইনেন্স বা ঋণও মঞ্জুর হয়ে যেতে পারে। পরের ধাপ হল হজ, ফিবছর বড় বড় গরু কোরবানি দিয়ে একবেলা গরিবদুঃখীকে পেটপুরে খাইয়ে সারাজীবনের জন্যে গোলাম করে রাখা। অন্য ধর্মের লোকেরাও তাদের উপাসনালয়ে যায়, কিন্তু সাথে সাথে তারা ত্রাণশিবিরেও যায়, প্রাণের ভয় উপেক্ষা করে দেশবিদেশে যায় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। যায় বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, ভূমিকম্পে, ঘূর্ণিঝড়ে, গণহত্যায়। বড় বড় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ দুর্ঘটনায় আজ পর্যন্ত কোনও টুপিদাড়ি জোব্বা পরিহিত দরবেশের উপস্থিতি লক্ষ্য করিনি আমি, এমনকি মুসলমান দেশেও। কিন্তু তারা মসজিদে যাবে দিনে পাঁচবার। কাজকর্ম গোল–ায় গেলে যাক, ব্যবসাবাণিজ্য অফিসআদালতের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয় হোক, কিন্তু আল–ার ৩ সাথে মোলাকাত করার জন্যে মসজিদে তাদের যেতেই হবে। মসজিদে না গেলে আল–া উপোস করবে, এমন একটা ভাব।

বাংলাদেশে মাথাপিছু মসজিদের সংখ্যা পৃথিবীর কোন দেশের তুলনায়ই কম নয় হয়ত, অথচ বাংলাদেশই গত তিনবছর ধরে দুর্নীতির শীর্ষস্থান দখল করে বসে আছে। হুমায়ুন আজাদ প্রায় খোলাখুলিভাবেই বলেছেন যে একটির সঙ্গে আরেকটির বিভেদ তো নেই–ই বরং একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। মসজিদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের জন্যে আমাদের দেশের সমাজ, সংসদ ও ফলত সরকার ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি সপ্তাহের কোন্ দিনগুলো কাজের আর কোন্‌গুলো ছুটির। (রসপ্রিয় লোকেরা হয়ত টিপ্পনী কাটবেন, সরকারী অফিসে তো সব দিনই ছুটির, আর বেসরকারী জগতের সব দিনই কাজের।) সরকারী ছুটির দিন ক'টি – একটি, দেড়টি না দু'টি ? এক সরকার বলে দুই, আরেক সরকার সেটাকে বদলে বলে দেড়, আরেক কর্তা এসে বলে, না, একটিই যথেষ্ট। মূল কারণ ওই একটাই, মসজিদ, মুসুল–ীরা জুম্মায় যাবে পবিত্র শুক্রবার। শুক্রবারের পবিত্রতা রাখতে গিয়ে জাতির উৎপাদনশীলতা অন্যান্য জাতির তুলনায় অন্তত এক–পঞ্চমাংশ কমে গিয়েছে।

মসজিদের প্রতি আমাদের সম্প্রদায়টির মজ্জাগত আসক্তি থেকে পশ্চিমের প্রবাসী বাঙালিরাও মুক্ত নয়। বরং উল্টো। দেশ থেকে

বেরুবার পর দেশপ্রেমটা যেমন ক্রমেই বাড়তে থাকে মসজিদপ্রীতিটাও মনে হয় তার সঙ্গে তাল রেখে চলে। প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে চলছে যে এখন আমাদের আশু প্রয়োজন ঃ এক, প্রত্যেকটি বড় শহরে অন্তত একটি কমিউনিটি সেণ্টার ; দুই, একটি বাঙালি নির্যাতিত নারীকেন্দ্র (দেশের নারীনিপীড়ন প্রবাসেও প্রায় সমপরিমাণে বিদ্যমান) ; ও তিন, একটি অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধসদন। এগুলোর কোনটির প্রতিই আমাদের তথাকথিত নেতাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আগ্রহ আছে মসজিদ ফা□। আগ্রহ আছে বার্ষিক বনভোজনে, বার্ষিক নির্বাচনে এবং বার্ষিক মারামারিতে। মসজিদে যারা যায় না তাদের ওপর প্রচ□ সামাজিক চাপ যাওয়ার জন্যে। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান থেকে প্রাক্তন জামাত, রাজাকার, আলবদর আর আলসাম্‌সের মাননীয় সদস্যগণ বা তাঁদের বংশধরগণ দলে দলে অবতীর্ণ হচ্ছেন এই অভিশপ্ত নাসারাদেশের বিভিন্ন শহরের মসজিদ প্রাঙ্গনে। তাঁদের পবিত্র মিশন হচ্ছে আমরা যারা মসজিদে যাই না বা যেতে চাই না তাদের নানারকম ভয়ভীতি দেখিয়ে মসজিদে নিয়ে যাওয়া। তবলীগওয়ালারা, মুজাহিদওয়ালারা, তালেবানওয়ালারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সময়ে অসময়ে, খাবার টেবিলে বসার পর, পরিবারের সাথে আরাম করে বসার পর বা রেডিও, টিভি ডিভিডিতে ভাল একটা অনুষ্ঠান চলার কালে, মোৎসার্ট, বেথোফেন কিম্বা প্রিয় কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাঝখানে, সদলবলে হাজির হন দরজায়। জীবনযাপন আমরা যেভাবেই করি না কেন তাতে ওঁদের কোন আগ্রহ নেই, আগ্রহ হল আমরা মসজিদে যাই কিনা। ত্রিশ চলি-শ বছর আগে এই উপদ্রবটা ছিল না প্রবাসে, এখন তাঁরা পথে পথে, সর্বত্র। ত্রিশ চলি-শ বছর আগে দেশ থেকে পঁচিশ ত্রিশ বছর বয়স্ক শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এসে শ্রদ্ধাভরে সালাম করত। এখন গ্রামগঞ্জ থেকে মাদ্রাসাপড়া স্বল্পশিক্ষিত কিশোর বা যুবক এসে আমাকে নৈতিক শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে আমারই বাসস্থানে, আমাকে মসজিদের পথ দেখাতে চায়, যে মসজিদের পাশ দিয়ে আমি সপ্তাহে অন্তত একবার গাড়ি করে যাওয়াআসা করি। এদের অত্যাচার আমাকে আলফ্রেড হিচককের সেই 'ব্যাট্‌স্' ছবিটার কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকের মুসলমান-ঘরে-জন্মানো সুশীল প্রবাসীদের জীবন লাখো লাখো ধর্মীয় বাদুড় দ্বারা আক্রান্ত।

আমাদের শেষ (গৌণতম নয় যদিও) অবসেশনটা হল নারী। নারী নিয়ে পুরুষের দারুণ মাথাব্যথা আদিকাল থেকে। কি এক দুর্বোধ্য কারণে নারীর প্রতি বিশ্বাস, আস্থা বা সম্মানবোধ কোনটাই আয়ত্ত করতে পারেনি পুরুষ। আমাদের সমাজে শুধু নয়, সব সমাজেই। পুরুষতন্ত্র আগে যেমন ছিল এখনো প্রায় তেমনি আছে, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজগুলোতে। নারীভীতি, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নারীবিদ্বেষে, তাকে সুন্দরভাবে মদদ জুগিয়েছে ধর্ম। পৃথিবীতে কত হাজার ধর্ম আছে তার সঠিক হিসেব কারো জানা আছে কিনা সন্দেহ, কারণ প্রতিবছরই তো নতুন নতুন ধর্ম জন্ম নিচ্ছে কোথাও-না-কোথাও। ধর্মগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির বিভেদ মানবজাতির মতই প্রাচীন, তবে দু'টি ব্যাপারে তাদের মিল আছে। এক, প্রত্যেকেরই বিশ্বাস তার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম (বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের গোড়াটাই এখানে) ; দুই, নারীকে দাবিয়ে রাখতে হবে। এই নারীদমনের ষড়যন্ত্রে পুরুষ ঈশ্বর নামক একটি শক্তিকে ব্যবহার করেছে দারুণ কৌশলের সঙ্গে। নারীকে দাসত্বের ভূমিকায় স্থায়ীভাবে স্থাপন করারই এক (আপাত) দৈবাদেশপ্রাপ্ত বিস্তারিত ব্যবস্থা। কালে কালে এই দাসীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে কিঞ্চিৎ, কিন্তু নারীর তিনটি প্রধান কর্তব্যের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি - এক, পুরুষের যৌনসুখদান ; দুই, সন্তানধারণ ও পালন ; তিন, গৃহ পরিচারনা (পরিচালনা নয় কিন্তু, সেটা পুরুষের এলাকা)। ইসলামে, গোড়ার দিকে, মেয়েদের খানিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সামাজিকভাবে তাদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি তাতে। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাকের অধিকার এখনো শুধু পুরুষেরই, ধর্ষিত হলে নারীকেই জোগাতে হয় চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষ সাক্ষী, নইলে ধর্ষণের শাস্তি ভোগ করতে হয় তাকেই। এশিয়া ও আফ্রিকার কোন কোন মধ্যযুগীয় সমাজে (হুমায়ুন আজাদের মতানুসারে সব মুসলমান সমাজই মধ্যযুগীয়) নারীর যৌনচেতনাকে এতটাই ভয় পায় পুরুষ যে শৈশবেই তার যৌনাঙ্গকে বিকল করে দেওয়া হয় যাতে যৌবনে সে-মেয়ে কোনদিন পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। কথিত আছে যে নবীজীর এক বিশিষ্ট সাহাবা বিশ্বাস করতেন যে মানবিক কামাকাঙ্ক্ষার একভাগ যদি পুরুষের হয় নয়ভাগ নারীর। পুরুষের যৌনকামনা নির্দোষ ও স্বাভাবিক, নারীর যৌনকামনা অস্বাভাবিক, অশুদ্ধ ও দ□নীয়। নারীর দৈহিক বিশুদ্ধির চেয়ে পবিত্র জিনিস বিরল আমাদের সমাজে। সেই কারণেই তাকে অন্দরবন্দী করার এত উদ্যোগ আয়োজন। সেজন্যেই ওদের পর্দার অন্তরালে অসূর্যম্পস্যা করে রাখতে হয়। তালেবানরা, ইরানের মোল-ারা, সেকারণেই ধর্মপুলিশ পাঠিয়ে ওদের পায়ের নখ বের হয়ে থাকলে ডা□া মেরে শায়েস্তা করে। আমাদের তালেবান ব্রাদাররা তো মেয়েদের স্কুলকলেজই বন্ধ করে দিয়েছিল। তাঁদেরই মন্ত্রশিষ্যরা এখন আমাদের দেশে উঠে পড়ে লেগেছেন বাংলাকে আফগান বানাবার জন্যে যাতে আমাদের মেয়েরা আফগানিস্তানের গুহাবাসীদের মত অন্দরে

গিয়ে খিড়কি লাগিয়ে দিতে বাধ্য হয়। মুসলমান নারীর চিত্র হুমায়ুন আজাদের লেখাতে যেভাবে ফুটে উঠেছে সেভাবে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সমতুল মেধা বা জ্ঞান আমার নেই।

আমার ছোটবেলায় আর যৌবনে, যখন দেশে থাকতাম, তখন হিজাব শব্দটার উৎপত্তি হয়নি, অন্তত আমাদের দেশে। আমার মাবোন-আত্মীয়দের কেউ কেউ বোরখা পরতেন, বিশেষ করে প্রবীণবয়স্করা, অনেকেই পরতেন না। অবশ্য ইসলাম তখনো ছিল, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত-আজান-ফেৎরা তখনো পুরোদমেই হত। কারো কারো মতে তখনই ছিল সত্যিকারের ইসলাম। হারামী উপায়ে অর্জিত টাকা পকেটে নিয়ে সারা শহর ঘুরে হালাল মাংস খোঁজার হিড়িক লাগেনি তখনো। তখন কোন জোর জবরদস্তি ছিল না। রোজা না রাখলে কাউকে রাস্তায় ধরে পেটানো হত না। বোরখা না পরলে তাকে রিক্সা থেকে নামিয়ে অপমান করা হত না। কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়েরা রিক্সায় করে, বেণী দুলিয়ে বা খোঁপায় ফুল লাগিয়ে, ক্লাসে যেত নিশ্চিন্তে, নির্বিকারে। হিজাব তখনো ধর্মের পতাকা হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ করে আশির দশক থেকে (হোমায়নি সাহেবের সিংহাসনে বসার পর পর) কানে আসতে লাগল এই অদ্ভুত শব্দটা। অটোয়ার রাস্তায় একটি দুটি মেয়েকে চুলঢাকা অবস্থায় দেখে প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা কি। তারপর জানা গেল এর নাম হিজাব। এ'ও জানলাম যে এটা মুসলমান মেয়েদের মুসলমানিত্বের পরিচয় বহন করে। তাই নাকি ? আমাদের মাবোনেরা তাহলে পরিচয়হীন ছিলেন ! এখন তো রীতিমত হিজাবী বন্যা সারা পৃথিবী জুড়ে। মেয়েরা যখন নিজের ইচ্ছাতে কোন পোশাক পরে, বা নিজের ইচ্ছাতে কোন পোশাক পরে না, তখন তাদের ইচ্ছাকে আমি সম্মান করি, তাদের পোশাক-আশাক নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করাটাকে অরুচিকর ও অযাচিত মনে করি। কিন্তু যখন ওটাকে ধর্মের বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা গত পাঁচশ বছর ধরে কোনদিনই আমাদের দেশে ছিল না, তখনই আমি আপত্তি জানাই। এতে অনেক মেয়েরই সানন্দ সম্মতি থাকতে পারে,

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যজাত নতুন প্রথাটি যে কোন নারীর মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত হয়নি সেটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। আজকে প্রবাসের রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ, অফিস আদালত হিজাবে হিজাবময় হয়ে উঠেছে – বিদেশে জন্মানো কচি কচি কিশোরীও এটা পরতে শুরু করেছে দারুণ দম্ভের সাথে। আজকে ক্যানাডা-আমেরিকা, বিলেত-ফ্রান্সে যত হিজাব দেখছি গতবার ঢাকায় গিয়ে তত হিজাব দেখিনি। হুমায়ুন আজাদ পর্দা আর হিজাব নিয়েও অনেক তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ প্রবাসের হিজাব তিনি ততটা দেখবার সুযোগ পাননি। দেখলে আরো কত অনল বেরুত তাঁর কলম থেকে কে জানে।

এক বিবাহিত বাঙালি মুসলমান যুবক আমাকে প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলছিল, মীজানভাই, আপনি নিশ্চয়ই পর্দাপ্রথায় বিশ্বাস করেন ! কথাটা সে বলছিল তার স্ত্রীর উপস্থিতিতে, হয়ত তাকে লক্ষ্য করেই। প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হয়ে আমি একমুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থাকলাম ওর দিকে। বলে কি ছেলে ! ঠিক শিক্ষিত না হলেও একটা দুটো সার্টিফিকেট হয়ত তারও আছে। বলতে গেলে বিলেতআমেরিকাতেই মানুষ হয়েছে (বা হয়নি !)। থাকে টরন্টোর মধ্যবিত্ত আন্তর্জাতিক এলাকাতে। আমি হলাম তার দ্বিগুণ বয়সের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, যাকে লেখক হিসেবে কেউ কেউ নারীবাদী বলে গাল দেয়। আমার লেখা স্পষ্টতঃই সে পড়ে না কোনদিন, তাই বলে কেমন করে সাহস পেল সে ফুস করে এমন একটা উদ্ধত প্রশ্ন করতে। মনোভাবটা কি তার একার, না প্রবাসের অনেক মুসলমান ছেলেদের মনেই এই পর্দাপ্রীতি ঢুকেছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এটা মোটেও বিরল ঘটনা নয়, আজকাল নাকি অনেক বাঙালি মুসলমান ছেলেই বউকে, বোনকে, মাকে, খালাকে, বোরখা পরাতে চায়, প্রবাসের এই মুক্ত সমাজে। মুক্ত সমাজে বাস করে কিছু মানুষ সত্যি সত্যি মুক্ত হয়, অধিকাংশ মানুষ হয় আরো অন্ধ। উপরোক্ত ছেলেটিকে যখন জিজ্ঞেস করলাম কেন সে বোরখা সমর্থন করে, বলল, মেয়েছেলের শরীর দেখা গেলে পুরুষের উত্তেজনা বাড়ে ! তখন আমার মনে পড়ে গেল আশির দশকের একটি অসাধারণ দৃশ্য – ক্যানাডার বেসরকারি টেলিভিশন সিটিভি-তে দেখা। নারী সাংবাদিক অ্যানা মারিয়া ট্রমণ্টি ইরানের পবিত্রভূমি কুমনগরে গিয়েছিলেন হোমায়নির উত্তরসূরীর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে। একটি প্রশ্ন ছিল ঃ ইরানের পর্দাপ্রথায় এত কড়াকড়ি কেন যে মাথার চুল পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হয় ? উত্তরসূরীর স্পষ্ট নির্বিকার জবাব ঃ তা নাহলে পুরুষদের গোপনাঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে !

ধর্মবিষয়ে হুমায়ুন আজাদ বিস্তর লেখালেখি করেছেন। তাঁর সব লেখা পড়বার সুযোগ হয়নি, এবং যা পড়েছি তার সবকিছুর সঙ্গে হয়ত একমতও নই আমি। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের বিশালতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ধর্মকে তিনি হালকাভাবে নেননি। ধর্মকে তিনি খেয়ালখুশিতে বর্জন করেননি, প্রচুর পড়াশুনা করেছেন তার ওপর, গভীর চিন্তাভাবনা দিয়েছেন তাকে, ধর্ম নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন বিজ্ঞজনের সাথে। তাঁর ধর্মচিন্তাতে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা সহজাত বিদ্বেষ ছিল না। একাত্তরের রক্ত তাঁর মর্মমূলে প্রচ□ ঝাঁকুনি দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই ঝাঁকুনির ফলেই তাঁর বিশ্বাসমালা গড়ে ওঠেনি। যথেষ্ট চিন্তা, যুক্তি ও বিচারবিশে-ষণ দ্বারাই তিনি আবিষ্কার করেছেন ধর্মকে। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি কট্টর ইসলামীদের যে জগতটার সন্ধান পেয়েছেন তা এক শুষ্ক কাঠিন্যময় মরুভূমির জগত যেখানে ঘাস গজায় না, পাতা নড়ে না, জীব বাঁচে না, ফসল ফলে না। সে জগতে ফুল ফোটে না, পাখি ওড়ে না, হরিণ ছোটে না, বালিকা হাসে না, গাঁয়ের বধূ যায় না নদীর ঘাটে কলসিকাঁখে। এ এক অদ্ভুত ধূসর রঙের পৃথিবী যেখানে মানুষ গাইতে পারে না, নাচতে পারে না, আঁকতে পারে না। এখানে ক্যামেরা নিষিদ্ধ, সিনেমা নিষিদ্ধ, হাসি নিষিদ্ধ, প্রেম নিষিদ্ধ, কবিতা নিষিদ্ধ, বাদ্য নিষিদ্ধ। এখানে কুকুর অপবিত্র, শূকর অপবিত্র, মাদক অপবিত্র, ইহুদী অপবিত্র, পৌত্তলিক অপবিত্র। এ-জগতে মানুষের জন্ম হয় মৃত্যুর কামনায়, কারণ এখানে মৃত্যুর পরই জীবনের শুরু। এ-ধর্মে মৃত্যুর পর মদ্য নিষিদ্ধ নয়, কাম নিষিদ্ধ নয়, লাম্পট্য নিষিদ্ধ নয়, তাই এ-জগতের মানুষ মৃত্যুর বন্দনা করে। এ-জগতের একমাত্র ফসল মৃত্যু। সেকারণেই হয়ত এ-জগতে আত্মহত্যার এত গৌরব, বিশেষ করে যদি সে মৃত্যুর সাথে সাথে একটি দুঃসাহসী হত্যাকা□ের নায়ক হতে পারে। হত্যার জন্যে এ-জগতে বীরের

উপাধি আছে। সারা পৃথিবীর মানুষ, নাসারা পশ্চিমের মানুষ, অপবিত্র ইহুদী মানুষ, গবেষণাকক্ষে বসে কত কত আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করে ফেলছে – কম্পিউটার, ইণ্টারনেট, ডিজিটাল, ডিভিডি, লেজার, এক্সরে, এম আর আই ; চলে যাচ্ছে গ্রহান্তরে, শূন্য থেকে মহাশূন্যে। আর মুসলমান জগতের টুপিদাড়িওয়ালা বকপা□তেরা তাদের পিছু পিছু ছুটছে কোরাণ হাতে, হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছে কোথায় কোন্ সুরাতে ঠিক ঐ জিনিসগুলো আল-াপাক স্বয়ং উলে-খ করেছিলেন দেড় হাজার বছর আগে। ৯/১১-এর প্রলয়কা□ও নাকি কোরাণেই লিপিবদ্ধ ছিল। এ-দুঃখ কেমন করে ঘুচবে এ-সমাজের। পশ্চিম আবিষ্কার করে আশ্চর্য যন্ত্রপাতি, আর মুসলমান আবিষ্কার করে কোরাণের আশ্চর্য সুরা ! গত সাতশ' বছরের ভেতর মুসলিম জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার কি ? আত্মঘাতী বোমাবিস্ফোরক !

শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞানসাধনার হুমায়ন আজাদ আর ব্যক্তি হুমায়ুন আজাদ সম্ভবত এক মানুষ ছিলেন না। মিষ্টি স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার ও সহাস্যবদনতার খ্যাতি তাঁর ছিল না। তাঁকে যারা কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছে তাদের অনেকেই হয়ত তাঁর থেকে দুরত্ব বজায় রাখাই সমীচীন মনে করেছে। কিন্তু জনপ্রিয়তার চূড়াতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা লোকটার আদৌ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সৃষ্টিধর্মী মানুষ। লৌকিকতার আবেষ্টনীতে আবদ্ধ না রেখে তাঁকে বিচার করা উচিত তাঁর কাজ দিয়ে। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সবকিছুই চলে যায় – তার দেহ, প্রেম, চিন্তা, ব্যবহার, ভাষা, হাসি, দুর্মুখতা। কেবল একটা জিনিসই থেকে যায় – কাজ। কীর্তির চেয়ে মানুষ মহান – এই মন্ত্রে আমি বিশ্বাসী নই, হয়ত হুমায়ুন আজাদও ছিলেন না। ভবিষ্যতের প্রজন্ম তাঁর রুক্ষ মেজাজ দেখবে না, দেখবে তাঁর সীমাহীন কর্মমালা, তাঁর অফুরান রত্নভা□ার।

আমার ব্যক্তিগত বিচারে হুমায়ুন আজাদ দেশের সাহিত্য জগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রধানত দু'টি কারণে। প্রথম, তাঁর দুরন্ত সাহস। অপ্রিয় কথা, যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, তাকে রঙিন কাগজে মুড়ে অম-মধুর বা শ্রুতিনন্দন করে তোলার কোনরকম প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। যাকে যা বলার, সে যে'ই হোক, তাকে তিনি ঠিক তাই বলে দিতেন, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, সরাসরি তার মুখের ওপর। তাঁর কোন হিরো ছিল না। শক্তিমানদের প্রতি আনত নম্রতায় দ্রবীভূত হয়ে স্তবস্তুতি পাঠ করার ভ□ামি তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। সত্য কথাটা (তাঁর মতানুসারে) তাঁর মত স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা এযুগের বাঙালি কবিসাহিত্যিকদের আর কারো মধ্যে আমি লক্ষ্য করিনি। শুধু রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের প্রতিই যে তীক্ষ্ণ উন্নাসিকতার ভাব পোষণ করতেন তিনি তাই নয়, সাহিত্যের

নামীদামী ব্যক্তিরাও তাঁর রোষবহ্নি থেকে উদ্ধার পায়নি। কাপট্য তিনি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। তাই বর্তমান বাংলাদেশের গোটা কপট সমাজটাই ছিল তাঁর প্রতিপক্ষ। উগ্র মৌলবাদের উত্থান তাঁকে ভীষণভাবে বিচলিত করেছে, তাদের সহিংস কর্মপদ্ধতি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পথেঘাটে। বর্বরভাবে আক্রান্ত হতে দেখেছেন শামসুর রাহমান, শাহরিয়র কবির, মুনতাসির মামুন প্রমুখ জাঁদরেল ব্যক্তিদের। কিন্তু তাতে তাঁর পায়ের হাঁটু ভয়ে কেঁপে ওঠেনি, বরং দ্বিগুণ ক্রোধে গর্জে উঠেছেন হিংস্র শ্বাপদের মত। রক্তচক্ষুর অগ্নিবাণ নিয়ে একাই দাঁড়িয়েছেন মৌলবাদ নামক এক বিশাল লৌহদানবের সামনে। আজকের দুর্ভাগা দেশটির বিপন্ন মানবতার একক যোদ্ধা ছিলেন এই মানুষটি। প্রতিমুহূর্তে আততায়ির আক্রমণকে প্রায় অনিবার্য জেনেও তিনি একা একা রমনার মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছেন গোধূলিবেলায়, হেঁটে হেঁটে বাড়ি এসেছেন বইমেলা থেকে। তাঁর মত সাহসী নেতা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ আর কখনো পাবে কি ? অচিরেই হয়ত না। তাঁর মৃত্যুতে এইটেই আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

হুমায়ুন আজাদের চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, নির্মল সততা, সেটাও তাঁকে স্মরণীয় কার রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ছিলেন এক অদুষণীয়ভাবে সৎ চরিত্রের মানুষ – সেটা তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করবে। স্বার্থের জন্যে সত্যের কিঞ্চিৎ বক্রায়ন, ক্ষমতার জন্যে ক্ষমতাবানের কাছে বিনীত আবেদন, পদোন্নতির খাতিরে পদস্থের পাদস্পর্শ – এসব নিম্নমানের দুর্বলতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। তিনি ছিলেন পাঁড় নাস্তিক। নাস্তিকদের দৈববিশ্বাস নেই, আত্মবিশ্বাস আছে। তথাকথিত ইমান তাদের নেই, কিন্তু সত্যিকারের ইমানী মানুষ সাধারণত তারাই। আদর্শগতভাবে যারা বিশুদ্ধ নাস্তিক, আদর্শগতভাবেই তারা বিশুদ্ধ সততাবাদী। হুমায়ুন আজাদ ছিলেন এই বিশুদ্ধ সততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত – শুধু ব্যক্তিচরিত্রে নয়, বুদ্ধিজীবনেও। লোকদেখানো ভ□ামিতে তিনি কখনো আকৃষ্ট হননি। আজকের বাংলাদেশী সমাজে যে-জিনিসটার সবচেয়ে অভাব, তারই বিশাল ভা□ার ছিল হুমায়ুন আজাদের চরিত্রে। তাঁর মৃত্যু সেই ভা□ারটিকেও নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। মৃত্যুর ক'দিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের দু'টি সমস্যা ঃ মৌলবাদ ও বন্যা'। আমি বলি বাংলাদেশের তিনটি জরুরী সমস্যা ঃ জঙ্গী মৌলবাদ, জঙ্গী মৌলবাদ ও জঙ্গী মৌলবাদ। বন্যাকে বাংলার মানুষ সামাল দিতে শিখেছে, কিন্তু তালেবানী মৌলবাদকে কেমন করে রুখবে তারা।

ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?

পাতাল আর কতদুর ?

অটোয়া

২২শে আগস্ট, ২০০৪

মুক্তিসন ৩৩